Final version/29.07.19

# ধানের দাম নেই, কৃষক সংকটেঃ উত্তরণের পথ সন্ধানে

-ড. আবুল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ,ও
সাধারণ সম্পাদক, কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

## ১.০ ভূমিকা ঃ

কৃষকরা ক্ষুব্ধ। তারা রাগ, হতাশা ও ক্ষোভে নিমজ্জিত। কিন্তু কেন কৃষকরা ক্ষুব্ধ? কেন ক্ষোভে-রাগে পাকা ধান পুড়িয়ে দেয় কৃষক? কৃষক কেন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। বঞ্চনার মানচিত্র আঁকতে হলে অনেক প্রশ্ন গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। এ অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট, অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় প্রশ্নসমূহ ও তার উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা এখানে, তিনটি ভাগে– ভূমিকা অধ্যায়ে।

### ১.১ ধানের দাম না পাওয়া কৃষক-বঞ্চনার প্রেক্ষাপট

নিজের পাকা ধান ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেন এক কৃষক। কৃষকের নাম আব্দুল মালেক সিকদার। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার বানকিনা গ্রামে তার বাড়ি। আব্দুল মালেক সিকদার নিজের পাকা ধানে আগুন ধরিয়ে দেন। খবরটা ব্যাপকভাবে প্রচারে আসে ১২ মে ২০১৯ তারিখে টেলিভিশন চ্যানেল এবং প্রিন্ট মিডিয়ার বদৌলতে। গণমাধ্যমের লোকদের প্রশ্নের জবাবে কৃষক আব্দুল মালেক সিকদার স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "ধানের দাম নেই, উৎপাদন খরচের অর্ধেকও না, ধান কাটার জন্য দিন মজুরকে প্রায় এক হাজার টাকা না দিলে ধান কাটার লোক পাওয়া যায় না। এক বিঘা জমির ধান কাটতে লাগে তিন জন মজুর । ৬ মণের বেশি ধান বিক্রি করতে হয় এক বিঘা ধান কাটাতে। ধান লাগানো থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত যা খরচ তাতে ধান ঘরে তুলে লাভ নেই। তাই মনের দুঃখে এক দাগে ৫৬ শতক জমির পাকা ধানে আগুন লাগিয়ে জমিটা পরিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এলাকার লোকজন এসে আগুন নিভিয়ে দিল।"

একই জেলার বাসাইল উপজেলার কৃষক নজরুল ইসলাম তার রোপনকৃত ২০ শতক জমির পাকা ধানে আগুন লাগিয়ে দেন (বাংলা ট্রিবিউন মে ১৪, ২০১৯)। কেন? ঐ একই কারণ। তাই আগুন লাগিয়ে দেন পাকা ধানে। মনের দুঃখে, রাগে ও ক্ষোভে।

মনের দুঃখে, রাগে ও ক্ষোভে কৃষকের নিজের পাকা ধানে আগুন দেয়া একটি ঘটনা, প্রতিবাদ তো বটেই। প্রতিবাদের পেছনে থাকে দীর্ঘ বঞ্চনা। দীর্ঘ বঞ্চনা ও বেদনা, বঞ্চিত মানুষের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। তে-ভাগা

আন্দোলনের কথা বাংলার মানুষ ভুলেনি, ভুলবেওনা। ফসলের ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার জন্য দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিবাদে জমিদার-জোতদার শ্রেণী তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিলো ঐ আন্দোলন। সালটা ১৯৪৬। জমিদার-জোতদার শ্রেণী নেই এখন, নেই উপনিবেশিক রাষ্ট্র। ফসলের ন্যায্য হিস্যার জন্য আন্দোলন এখন অতীত।

এবার বোরো মৌসুমে কৃষক ব্যাপক ক্ষতির স্বীকার হয়েছে। বাংলার সব কৃষক লোকসান গুনছে ধানে । ধানের দাম একেবারে নেই। তাই তারা ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ। আব্দুল মালেক সিকদার এবং নজরুল ইসলামের প্রতিবাদ ছিল প্রকাশ্যে। কিন্তু নিরবে সব কৃষক প্রতিবাদ করছে ধানের ন্যায্য মূল্য পাবার জন্য। ধানের দাম পাবার জন্য। ন্যায্য মূল্য অর্থাৎ ধান বিক্রি করে উৎপাদন খরচ উঠিয়ে কমপক্ষে শতকরা ২৫ টাকা লাভ হলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পেয়েছে বলা যাবে।

।

### ১.২ যে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে – অনুসন্ধানের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন

স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক নিজের জমিতে ধান আবাদ করে ধানের ন্যায্য মূল্য পেতে চায়। চুক্তি বর্গা নিয়ে বর্গাদার তার উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য চায়। ধান উৎপাদন করে কৃষক দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন করতে চায়। ধান উৎপাদন করে কৃষক নিজে বাঁচতে চায়, দেশকে বাঁচাতে চায়। ধান উৎপাদন করা ছাড়া এদেশের কৃষক যেমন বাঁচবে না; দেশও বাঁচবে না। সব জেনে-বুঝে কৃষককে তার ধানের ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে করা হচ্ছে কেন বঞ্চিত? কেন এ বঞ্চনার স্বীকার কৃষক? কেন তাকে তার পাকা ধান ক্ষেতে মনের দুঃখে-ক্ষোভে আগুন দিতে হয়? প্রতিবাদ করতে হয় কেন? কি কারণে কৃষক তার ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না? বাংলার কৃষককে ফেলেছে কে অথৈ সাগরে? মহাসংকটে? কৃষক এ মহাসংকট থেকে বেরিয়ে আসবে কিভাবে? কৃষক-বঞ্চনার কালোরাত ফুরাবে কি? না চলবে অনন্তকাল?

অনেক প্রশ্ন। প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে অনেক গভীরে যেতে হবে। কৃষকের ক্ষোভ আর বঞ্চনার আলেখ্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

### ১.৩ তথ্যভান্ডার ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়া

কৃষক কারা? নিজের জমিতে হোক বা বর্গা চুক্তি নিয়ে হোক ধান আবাদের সঙ্গে জড়িত সবাই কৃষক। কৃষকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলা ছাড়া কৃষক বঞ্চনার চিত্র পাওয়া দূরূহ। তাই বিভিন্ন পর্যায়ের (নিজের জমি আছে এমন কৃষক, বর্গা চুক্তিতে ধান আবাদ করা কৃষক) কৃষকের সঙ্গে ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনা করা হয় প্রতিবেদনটি তৈরি করার জন্য। ধান উৎপাদনে খরচ, ধান আবাদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নানান বিষয় নিয়ে কথা হয় কৃষকের সাথে। ধানের দাম পাওয়া-না পাওয়া, কৃষি উপকরণের দুর্লভ্যতা-সহজলভ্যতা ইত্যাদি খন্ড খন্ড বিষয়ে তথ্য নেয়া হয় কৃষক থেকে। ধান যারা ক্রয় করেন, যারা ধান ব্যবসায়ী, যারা হাসকিং এবং অটো রাইস মিলের মালিক-তাদের

সঙ্গেও ব্যাপক আলোচনা হয়। তাদের দেয়া তথ্য এ প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। কৃষি মজুর, ধান কেনা-বেচায় ফরিয়া, মধ্যস্বত্বভোগী এবং এলাকার নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং রাজনীতির সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং দলের সংঙ্গে আলোচনা হয় ধানের দামসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। ধান ক্রয়ে দুর্নীতি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ও ধান নিয়ে রাজনীতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সব তথ্য সংগ্রহ করা হয় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে। সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত অনুসন্ধানী রিপোর্ট থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে। নতুন জাতের ধান যারা উদ্ভাবন করেন এবং যারা কৃষি অর্থনীতিবিদ, যারা কৃষি বিশ্লেষক তাদেও দেয়া তথ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাদের মতামতগুলোকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংসদ সদস্য এবং সরকারের কৃষি ও ভূমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ধান-চাল বিষয়ে তথ্য এবং ভাষ্য প্রচার হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ঐ সূত্রগুলো থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে প্রতিবেদনটি প্রণয়নে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য এবং সেকেন্ডারী উৎস থেকে তথ্য, সবই কৃষকের ধানের দাম পাওয়া-না পাওয়া এবং কৃষকের দীর্ঘ বঞ্চনার আলেখ্য ঘিরে।

## ২.০ ধানের দাম ও কৃষক-বঞ্চনা শুরু

কৃষক কখনও ধানের ন্যায্য দাম পেয়েছে কি না? পেলে কখন কিভাবে? ধানের ভালো দাম পাওয়া থেকে বহু বছর কৃষক বঞ্চিত। কেন, কিভাবে? তা থাকবে – এ অধ্যায়ে। থাকবে কৃষকের হতাশার চিত্র। বঞ্চনার দীর্ঘ পথে ক্ষোভ- বিক্ষোভের চালচিত্র।

### ২.১ ধানের ন্যায্য মূল্য পাওয়া না পাওয়ার স্মৃতি রোমন্থন

রংপুরের পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল এবং দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার কৃষকের সঙ্গে দলগত আলোচনা হয়। আলোচনাগুলো ধানের দাম, কৃষকের সুবিধা-অসুবিধা, কৃষক-বঞ্চনার নানান দিক নিয়ে। মে, ২০১৯ সালের শেষ সপ্তাহে ও জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আলোচনাগুলো হয়।

জিজ্ঞাসা করা মাত্র সবাই এক বাক্যে বলেন, ধানের (বোরো ধান) দাম এবার একেবারে নেই। উৎপাদন খরচের অর্ধেক দাম। আগের বছরগুলোতে ধানের ভালো দাম পাওয়া গিয়েছিল কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেন ভালো দাম পাওয়া গেছে একবার। ফখরুদ্দিনের আমলে। সালটা না বলে ফখরুদ্দিনের আমল বলতেই পছন্দ তাদের। বোরো এবং আমন দু'টো ধানের মৌসুমেই লাভ হয়েছিল কৃষকের। প্রায় হাজার টাকা (৩৭.৫ কেজি) মণ পেয়েছিলেন। তারপর ধান আবাদ করে লাভের মুখ দেখে নি কৃষক। আর এবার তো ধান আবাদ করে মহা দুঃশ্চিন্তায় । ধানের দাম পানির দামের চেয়ে কম। কৃষকের সঙ্গে দলগত আলোচনায় অন্তহীন হতাশার চিত্র ফুটে উঠে। শুধু একটি ভালো স্মৃতি– ফখরুদ্দিনের আমলে ধানের ভাল দাম পাওয়ার স্মৃতি ।

ফখরুদ্দিনের আমলে ধানের ভালো দাম কেন? অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদের একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা থেকে ঐ সময়ে ধানের দাম ভালো পাবার গল্পটির পেছনের গল্প জানা যায়। তিনি লেখেছেনঃ

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে, যা ২০০৭-০৮ সালে..... সংকটে রূপ নেয়। .....উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের দেশ হিসেবে পরিচিত ভারতকেও ২০০৬ সাল থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে বিগত কয়েক মৌসুমে ধানের ভালো ফলন হওয়ায় এ মুহূর্তে আমাদের চাল আমদানি করতে হচ্ছে না। আমাদের দেশের বাজারে মোটা চালের খুচরা দাম ৩৩ টাকা (কেজি) পর্যন্ত উঠেছিল ২০০৭-০৮ সালে, এক বছর আগেও দাম ছিল ২০ টাকার কম। (সূত্র ঃ প্রথম আলো, ০৪/০২/২০১০)।

মোদ্দাকথায় ২০০৭-০৮ সালে ধান-চাল ব্যবসায়ীরা, চালকল মালিকরা প্রচুর পরিমাণে ধান ক্রয় করে এবং চালের দাম বাড়িয়ে দেয়। চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় ঐ সময়কার সরকার চালকল মালিক এবং চাল ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে অনেক দেন-দরবার করে। রেইডও দেয়া হয় চালকল মালিকদের গুদামে। কিন্তু চালের দাম কমেনি। সারা দেশের চাল ব্যাবসায়ীরা এবং দিনাজপুরের পুলহাটের শত শত চালকল মালিক এবং চাল ব্যাবসায়ী ঐ বছর পর্যাপ্ত লাভ করে। চাল ব্যাবসায়ীদের সিন্ডিকেট চালের দাম বাড়িয়ে দেয় এমন অভিযোগও ওঠে ঐ সময়। তবে কৃষক প্রায় হাজার টাকা মন ধান বিক্রি করে খুবই সন্তুষ্ট ছিল। ধান উৎপাদনে ঐ সময় কম খরচ হয়েছিল কৃষকের। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল। কৃষি মজুরের মজুরিও ছিল কম। দুইশত টাকার মধ্যে মজুরী। তারপর ধানের ভালো দাম পাবার কোন স্মৃতি নেই কৃষকের । বছরের পর বছর শুধুই হতাশা। লাভের খাতা শুন্য।

### ২.২ কৃষকের লাভের খাতা শূন্য – ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল

ধান উৎপাদনকারী কৃষকের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় ধান আবাদের খরচ ও লাভ-লোকসানের চালচিত্র। রংপুর, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুরে আগে হাইব্রিড ধান কম হতো। ২০১০ সালের পর উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড এবং বিরি ২৮, ২৯ ধানের চাষ বৃদ্ধি পায়। চায়না, মালা, রত্না মালা ধান অনেক বেশি আবাদ হতো ২০১০ সালের আগে। ঐ ভ্যারাইটিগুলোর বোরো মৌসুমে প্রতি বিঘায় ফলন ১৮-২০ মণ। বর্তমানে হাইব্রিড এবং বিরি ২৮, ২৯ এর ফলন প্রতিবিঘায় ২৭-২৮ মন (বোরো মৌসুমে)।

জানা যায় ২০১২ সালে ধানের উৎপাদন খরচ ব্যাপক বেড়ে যায়। সার, কীটনাশকের দাম; চাষ ও ডিজেল খরচ এবং কৃষি মজুরের মজুরী বেড়ে যায়। প্রতি বিঘা বোরো ধান উৎপাদনে ছয়-সাত হাজার টাকা খরচ হয়। ছয় থেকে সাতশত টাকা প্রতিমণ বোরো ধান বিক্রি করে পোষায় না । প্রতিবছর ধানের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় কিন্তু ধানের দাম বাড়েনি। কৃষক কোন রকমে টিকে থাকার অবস্থায় অনেক বছর ধরে।

২০১৭ সালে হাওর অঞ্চলে বন্যা হয়। বোরো ধান তলিয়ে যায়। দেশে অন্যান্য অঞ্চলেও ধানে চিটা ধরেছিল । সরকারী হিসেব মতে, ১০ লাখ টন চালের উৎপাদন কম হয়েছিল। ঐ বছর দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং রংপুরের কৃষক মোটামুটি ধানের দাম পেয়েছিল । তবে লাভ হয় নি। কারণ উৎপাদন খরচ বেশি। প্রতিমণ ধান প্রায় ৮০০ টাকা বিক্রি করেও লাভ হয়নি কৃষকের । তবে ক্ষতিও হয় নি; ২০১৭ সালে বোরো আবাদ করে। মোট কথা, ২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত কৃষকের "লাভের খাতা শূন্য"।

**২.৩. ২০১৮ সালে ধানের দামে কৃষক হতাশ**

ধানের দাম পাবার আশায় কৃষক বোরো আবাদ বাড়িয়ে দেয় ২০১৮ সালে। হাওর অঞ্চলে বাম্পার ফলন হয়। বস্তুতঃ ২০১৮ সালে বোরো আবাদ ভালো হয় দেশব্যাপী। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিষয়ক সংস্থা ইউএসডি ২০১৮ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্বে ফসলের উৎপাদন বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে এবার আগের বছরের (অর্থাৎ ২০১৭ সালের) তুলনায় ৬.৩ শতাংশ বেশি ধান উৎপাদিত হয় । গত বছরের তুলনায় ১ লক্ষ হেক্টর বেশি জমিতে ধান চাষ হয় (সূত্রঃ প্রথম আলো,০২ জুন ২০১৮)। ১ কোটি ধান চাষী বোরো আবাদ করেছিল ঐ বছর।

কৃষক বোরো ধানের দাম পেল প্রতি মন ছয়-সাতশত টাকা। লাভ হয়নি কৃষকের। ঐ একই কথা; হতাশার কথা – "পোষায় না"। ২০১৮ সালে কৃষক আশা করেছিল ধানের দাম পাবেন। কিন্তু তারা জানতেন না, দাম না পাবার সবব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক আগেই করে রাখা হয়েছে! ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার কৃষকের সঙ্গে দলগত (Focus group discussion) কয়েকটি আলোচনা থেকে জানা গেল: ২০১৭ সালে ধানে লাভ হয়নি, কিন্তু ক্ষতিও হয়নি। কিন্তু ২০১৮ সালে ক্ষতি হয়েছে। ছয়-সাতশত টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করে লাভ হয় নি; ক্ষতি হয়েছে। হতাশার চিত্র ! পন্ডশ্রম। ক্ষতি হলেও ধান আবাদ না করে উপায়তো নাই!

২০১৮ সালে ধানের দাম কেন পায়নি কৃষক? এ বিষয়ে অনেক তথ্য-উপাত্ত আছে। সাংবাদিক ইফতেখার মাহমুদের অনুসন্ধানী রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ধানের দাম কৃষক না পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে; ২০১৭ সালের মে-জুন মাসে। কেমন করে? ২০১৭ সালে তিন দফা বন্যায় বোরো ধান নষ্ট হয় ১০ লাখ টন। ঘাটতি মেটাতে সরকার আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দেয়। এই সুযোগে গত এক বছরে (অর্থাৎ মে ২০১৭-জুন ২০১৮) চাল আমদানি হয়েছে প্রায় ৩৭ লাখ টন। আমদানির অপেক্ষায় আছে আরো ৪৫ লাখ টন। ২০১৮ সালে বোরো মৌসুমে ধানের দাম না পাওয়ার কারণ চাল আমদানির এ মহোৎসবের মধ্যে নিহিত। ইফতেখার মাহমুদ একই রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন " উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এ বছর প্রতি কেজি ধানে ২ টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে কৃষকের (প্রথম আলো, ২ জুন ২০১৮)। ১০ লাখ টন ঘাটতি মেটানোর জন্য ৮২ লাখ টন চাল আমদানি। প্রয়োজনের

তুলনায় আটগুণ বেশি চাল আমদানি করলে ধানের দাম পাবে কৃষক? না, পায়নি । চাল আমদানির মহোৎসব– একটিই কারণ ।

২০১৮ সালে বোরো ধান ওঠার আগে চাল আমদানি শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে কৃষক ধানের দাম পেতো। লাভ হতো কৃষকের। চাল আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ আনা হয় নি। ২০১৮ সালে মাত্র ২৮% আমদানি শুল্কে চাল আমদানির সুযোগ করে দেয়া হয়। ভারতে চালের দাম কম হওয়ায় আমদানি অব্যাহত থাকে। কার স্বার্থে চাল আমদানি শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয় নি? এটা তলিয়ে দেখা জরুরি।

**২.৪. ২০১৯ সালে চরম বঞ্চনা ও দূর্ভোগে কৃষক**

কৃষকের থেকে পাওয়া মাঠ পর্যায়ের তথ্যগুলো ভয়াবহ বার্তা দেয়। কৃষক এবার বোরো ধানের উৎপাদন খরচের অর্ধেক দাম পেয়েছে। অসহনীয় বঞ্চনার স্বীকার কৃষক। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে কৃষক স্তম্ভিত। কৃষক বঞ্চনার নানান দিক আলোচনার আগে দিনাজপুরের চালের আড়তদার ও চালকল মালিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো আলোচনা করা যাক। "দিনাজপুর আড়তদার মালিক সমিতি" ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য ৫৬ জন। এ সমিতির সব সদস্যই চাল ব্যবসায়ী। সমিতির ৯০% সদস্যই অটোমেটিক রাইস মিলের মালিক। সমিতির সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং আরো কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে কথা হয়। ধান-চালের হালচাল সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য দেন তারা। অব্যাহত এবং অতিরিক্ত চাল আমদানির জন্য কৃষক এবার ক্ষতির স্বীকার। লাগামহীন চাল আমদানি শুধু কৃষকেরই ক্ষতি করেনি, চালকল মালিকরাও গত দু'বছর ধরে ক্ষতির সম্মুখীন। চাল আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্য দেন তারা (চালকল মালিকরা)। তথ্যগুলো নিম্নরূপঃ

**এক.** চাল আমদানি শুল্ক মাত্র ২৮%। এ কারণে আমদানিকারীরা অতিরিক্ত চাল আমদানি করেছে । লাভ করেছে তারাই। সরকার চাল আমদানিকারকদের সুযোগ দিয়েছে।

**দুই.** কৃষক, চাল ব্যবসায়ী ও চালকল মালিক সবাই ক্ষতিগ্রস্ত চাল আমদানির কারণে। গত দু'বছর চালকল মালিকরা সীমাহীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুলনামুলকভাবে কিছুটা কম দামে ধান কিনেও লাভ করা যায়নি। গত ২ বছরে আমদানি করা চালই মিল মালিকদের ক্ষতি করেছে । রাইস মিল মালিকরা ২০১৮ সালেও কৃষককে ভালো দাম দিয়ে ধান কেনার সাহস করেনি, বিদেশ থেকে অতিরিক্ত চাল আমদানির কারণেই।

**তিন.** এবার (২০১৯ সালে) রাইসমিল মালিকরা নিরুপায় হয়ে আরো কম দামে ধান কিনছে। তাই কৃষক ধানের দাম পায়নি। কৃষক ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। চাল আমদানির ক্ষেত্রে সরকার ৫৫% শুল্ক নির্ধারণ করলো গত মে মাসে, যখন কৃষক ৭০-৭৫% ধান বেচে দিয়েছে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে চাল আমাদানি নিয়ন্ত্রণ করা হলে

কৃষক ধানের দাম পেতো । সরকার কৃষকের স্বার্থ দেখতে চায় নি। চাল আমদানিকারকদের স্বার্থই বড় করে দেখেছে।

চার. সর্বসাকুল্যে ৫৫% শুল্ক ঘোষণার পর আর চাল আমদানি হবে না। কিন্তু গত বছরের ২৮% শুল্কের চাল আমদানির প্রভাবতো এখনও রয়েছে বাজারে। ৫৫% শুল্ক ঘোষণার পর রাইস মিল মালিকরা কিছুটা বেশি দামে এখন ধান কিনছে। কৃষকের ঘরে তো ধান নেই এখন ।

পাঁচ. ৫৫% আমদানি শুল্ক বহাল রাখলে চাল আমদানি আর হবে না। ভবিষ্যতে কৃষক ধানের দাম পাবে; ব্যবসায়ীরাও ভালো ব্যবসা করবে।

দিনাজপুরের আড়তদার সমিতি এবং অটোমেটিক রাইস মিল মালিক সমিতির নেতাদের তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় অহেতুক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিদেশ থেকে চাল আমদানিই কৃষকের সর্বনাশ করেছে। কৃষক পানির দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এবং সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন প্রয়োজনের তুলনায় ছয়-সাতগুন বেশি চাল আমদানিকেই কৃষকের ধানের দাম না পাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জাতীয় সংসদে বাজেট কক্তৃতা এবং কৃষক -ক্ষেতমজুর কনভেনশনে তিনি বলেন, "হাওরে বন্যায় ১০ লক্ষ টন খাদ্য নষ্ট হলো, সেই সুযোগ নিয়ে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ টন চাল তারা বিদেশ থেকে আমদানি করেছে। যখন কৃষকের ধান উঠেছে তখন সেখানে ৪০ লক্ষ টন চাল তারা আমদানি করেছে, আরও ২০ লক্ষ টন চাল সরবরাহের পাইপ লাইনে রয়েছে (১৯ জুন, ২০১৯ রাশেদ খান মেননের বক্তৃতা; কৃষক-ক্ষেতমজুর কনভেনশন-২০১৯, রাশেদ খান মেননের বক্তৃতা, ১৫ জুন)।"

## ৩.০ চাল আমদানি ও রপ্তানি পলিসি প্রসঙ্গ – কৃষকের কি এসে যায়?

বিদেশ থেকে চাল আমদানি এবং বাংলাদেশ থেকে চাল রপ্তানি– এ বিতর্ক চলমান। আমদানি ও রপ্তানী বৈদেশিক সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে নানা মতামত। চাল আমদানি ও রপ্তানির পলিসি বিতর্ক। চাল ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের মতামত জানা যাবে – এ অধ্যায়ে ।

দিনাজপুরের চালকল মালিক সংগঠনের নেতাদের সংগে বিদেশ থেকে চাল আমদানি ও রপ্তানির চালচিত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। চাল আমদানি প্রসঙ্গে তারা জানানঃ

**এক.** বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না– এটাই বাস্তবতা। চাল আমদানি ৩ বছর পুরোপুরি বন্ধ রাখলেই ধান-চালের দাম বেড়ে যেতে পারে। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দূর্যোগে ধানের ফসল নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে বাংলাদেশ । তাই চাল আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না।

**দুই.** কোন বছর কতটা চাল আমদানি করতে হবে বা হবেনা– এ হিসাব করে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত একটি পলিসি থাকলে ঝুঁকি থাকে না। যখন তখন চাল আমদানি করা অথবা একেবারে চাল আমদানি বন্ধ করে দেয়া দু'টোই ঝুঁকিপূর্ণ।

**তিন.** কোনো কোনো বছর প্রাকৃতিক দূর্যোগে বা অন্য কোনো কারণে ধানের উৎপাদন কমে যায়। এরকম খবরের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। দূর্যোগের কারণে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশে আছে, থাকবেও। তাই চাল আমদানি করতে হয়, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য।

### ৩.১ চাল রপ্তানি প্রসঙ্গে আড়তদার ও চালকল মালিকদের মতামত

- চাল রপ্তানির প্রশ্নটি ব্যাপক আলোচনায় আসে এ বছর বোরো মৌসুমে ধানের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায়। কৃষক ধান আবাদ করে এবারেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। খাদ্যমন্ত্রী ধানের বেশি উৎপাদনকে দাম কমে যাওয়ার কারণ বলেছেন। সরকারের উচ্চপর্যায়ের নীতি-নির্ধারকরাও ধানের অধিক উৎপাদনকে দায়ী করতে চেয়েছেন এবং চাল বিদেশে রপ্তানির জন্য নানান বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে চালকল মালিকরা বলেন বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নি এখনও।
- বর্তমানেও চাল বিদেশে রপ্তানি সীমিত আকারে হচ্ছে। সুগন্ধি ও পোলাও-র চাল যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে যাচ্ছে। আগে চাল ব্যবসায়ীরা সরাসরি চাল রপ্তানি করতো, এখন তেমন করে না। বর্তমানে প্রাণ গ্রুপ, স্কয়ার ও উৎসব গ্রুপসহ অনেক নামী-দামি কোম্পানী প্যাকেটজাত চাল রপ্তানি করছে। চিনিগুড়া, কাটারীভোগ, স্থানীয় বাশমতি চাল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। পরিমাণটা হয়তো বিশাল নয়।
- প্রাণ এবং স্কয়ার কোম্পানী দিনাজপুর, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের ব্যবস্থাপনায় ধান সংগ্রহ করে চাল তৈরি করছে, রপ্তানির জন্য। ঐ কোম্পানীগুলোর গুদামও আছে ধান চাল রাখার জন্য।
- এ বছর বোরো মৌসুমে ধানের দাম পায়নি কৃষক। তাই সরকারের উচ্চপর্যায়ে চাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চাল রপ্তানির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। চাল ব্যাবসায়ীরা মিনিকেট চাল রপ্তানির প্রস্তাব দিয়েছে সরকারকে। সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত এখনো দেয়নি। মিনিকেট ধান আবাদ হচ্ছে যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও নাটোরসহ বেশ কয়েকটি জেলায়। মিনিকেট চালের ভোক্তা শহুরে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন। ৪০-৫০ টাকা কেজি মিকিকেট চালের। এ চাল বিদেশে রপ্তানি হলে ব্যবসায়ীরা লাভবান হবে,

কিন্তু দেশীয় ভোক্তাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাই চালকল মালিক নেতারা সিদ্ধান্ত নিতে বলেন ভেবে-চিন্তে।

- বিদেশে সবসময় চাল রপ্তানির বাজার পাওয়া গেলে এবং সরকারী অনুমোদন থাকলে চাল রপ্তানি করা যেতে পারে। চাল রপ্তানির ব্যবস্থা হলে কৃষক মোটা ধান (হাইব্রিডসহ মোটা চালের আরো ভ্যারাইটি) আবাদ করা ছেড়ে দিবে। আবার এটাও মনে রাখা দরকার বাংলাদেশে আবাদি জমি কমছে। সরকারী তথ্যমতে, প্রতি বছর প্রায় ১ শতাংশ করে ধানী জমি কমছে। বোরো মৌসুমে মোটা ধান আবাদ বর্জন করলে হাহাকার পড়ে যাবে দেশে। নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষ চাল কিনতেই হিমশিম খাবে। তাই চাল রপ্তানি করার বিষয়টা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সিদ্ধান্ত নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে (চাল ব্যবসায়ীদের মন্তব্য)।

### ৩.২ চাল রপ্তানি প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ মতামত

দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক ইফতেখার মাহমুদ "ধানের দাম আরো কমছে" এই শিরোনামে একটি রিপোর্ট করেছেন (প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০১৯)। ঐ রিপোর্টে তিনি চাল রপ্তানির সুযোগ এবং সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাস্কিং মিল মালিক সমিতির সভাপতির সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। মালিক সমিতির সভাপতি বলেন, "সরকার চাল রপ্তানির জন্য কোন নীতিমালা তৈরি করেনি। চাল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া হয় তা দিয়ে রপ্তানি করে পোষাচ্ছেনা। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম কম। তাই সরকার যদি ৩০ শতাংশ প্রণোদনা নির্ধারণ করে তাহলে রপ্তানি করা যাবে"। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ এম এম শওকত আলীর সঙ্গে চাল রপ্তানি বিষয়ে কথা হয়। সাবেক উপদেষ্টা বলেন, "ধান-চালের দাম বাড়ানো নিয়ে শুধু হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলে হবে না। দেশে আদৌ রপ্তানিযোগ্য চাল আছে কিনা----। চালের সামগ্রিক চিত্র বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে"। ইফতেখার মাহমুদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক সাত্তার মন্ডলের সঙ্গেও চাল রপ্তানি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। অধ্যাপক সাত্তার মন্ডল বলেন, " ধান চালের দাম কেন কম তা সঠিকভাবে অনুসন্ধানের জন্য চারটি তথ্য জানা দরকার।

এক. চাল কলের মালিকের কাছে কি পরিমাণ চাল আছে ও তাদের মজুদ ক্ষমতা কত;

দুই. ফরিয়া বা রাখি মালের ব্যবসায়ীদের কাছে ধানের মজুদ কী পরিমাণ;

তিন. কৃষকের কাছে সংগ্রহ করা চালের পরিমাণ কত; এবং

চার. ব্যবসায়ীরা কী পরিমাণ চাল মজুত করেছেন।

এর পরও জানতে হবে, দেশে চালের চাহিদা কত, কোন কোন দেশে এই চালের চাহিদা আছে ও তা রপ্তানি সম্ভব কি না"।

চাল রপ্তানির প্রচুর সম্ভাবনার কথাও বলেছেন কয়েকজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ এবং কৃষিবিদ। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রফেসর সেলিম রশিদ বলেন, "বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চাহিদা অনুযায়ী ধান উৎপাদনে সক্ষম একটি দেশ। কিন্তু আমরা আরও ২০ লক্ষ মেট্রিকটন অতিরিক্ত চাল উৎপাদন করতে পারি। যদি এই চাল বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যে প্রতি কেজি ৬০ টাকা দরেও বিক্রি করি, তাহলে আমাদের কৃষক বছরে এক লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারবে। দেশের কৃষকরা অতিরিক্ত এই চাল উৎপাদনে আগ্রহী হবেন যদি বিশ্ববাজার অনুযায়ী তারা ন্যায্য দাম পান। প্রখ্যাত কৃষিবিদ ডঃ জেড করিমও বলেছেন, "বাংলাদেশ বছরে ২০ মিলিয়ন মেট্রিকটন বাড়তি চাল উৎপাদন করতে পারে। বাড়তি চাল উৎপাদন ও রপ্তানির সঙ্গে মানুষের আয়ের পরিধিও বেড়ে যাবে। (চাল রপ্তানির সম্ভাবনা, দৈনিক সমকাল, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪)।" বিশেষজ্ঞদের চাল রপ্তানি বিষয়ে, পক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তি থেকে বোঝা যায় বিষয়টি নিয়ে আরো আলোচনা দরকার।

চাল আমদানি-রপ্তানির হালচাল জানা গেল। ফিরে আসা যাক কৃষকের ধানের দাম পাওয়া না পাওয়া প্রসঙ্গে। কেন কৃষক পাকা ধানে আগুন দিয়েছিল! ধানের দাম নিয়ে কতোবড় হতাশায় থাকলে কৃষক পাকা ধানে আগুন দেয়।

ধানের ন্যায্য  মূল্য না পেয়ে কৃষক কতটা ক্ষতিগ্রস্ত। কৃষকের ছোট ছোট গল্প শুনবো পরের অধ্যায়ে।

## ৪.০ ধানের দামে চরম হতাশা কৃষকের– কয়েকটি কেস স্টাডি

কৃষক বোরো ধান  আবাদ করে ক্ষতিগ্রস্ত। চরম অবহেলা করা হচ্ছে কৃষককে। হতাশার গভীর সাগরে কৃষক। শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

### কেস স্টাডি- ১ঃ বন্ধক নেয়া জমিতে বোরো আবাদ

ধান নিয়ে কথা হয় রংপুরের পীরগঞ্জের পলাশ মিয়ার সাথে। বয়স ২৬ বছর। প্রায় ৫ বছর ধরে ঢাকায় রিক্সা চালায়। আয় ভালোই হয়। ঢাকায় এক মাস রিক্সা চালিয়ে  প্রায় ৭/৮ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি যেতে পারে। আবার ১৫/২০ দিন পর ঢাকায় আসে ১ মাস কাজ করে। বাবার ২ বিঘা জমি আছে। ৩ টি এনজিওতে লোন আছে ২ লাখ টাকা পলাশের। ঋণের কিস্তি রিক্সা চালিয়ে পরিশোধ করে পলাশ। ৩ বছর আগে ৪ লাখ টাকা দিয়ে ৪ বিঘা জমি বন্ধক নেয়। বন্ধকের শর্ত টাকা ফেরত দিলে জমি ফেরত দিবে। বোরো এবং আমন ধান এ দু'মৌসুমে ধান আবাদ করে। গত দু'বছরে ভালো ফলন হয়েছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। গত বছর বোরো ধান প্রতি মণ ৬০০-৬৫০ টাকা আর আমন ধান প্রতি মণ ৬৫০-৭০০ টাকা দরে বিক্রি করে। আসলে আসল, চার লাখ টাকার বিনিময়ে।

পলাশ এ বছর (২০১৯ সালে) বোরো ধান আবাদ করেছিল ঐ ৪ বিঘা জমিতে। গত মে মাসে ধান কাটা ও মাড়াই করে বিক্রিও করা  হয়েছে। প্রতি বিঘাতে হাইব্রিড ধান হয়েছিল ২৭ মণ করে। এবার প্রতি মণ ৪৫০ টাকা দরে বিক্রি করেছে পলাশ। উৎপাদন খরচ তো উঠেইনি। প্রতি বিঘায় লোকসান ৫৪০০ টাকা। জমির মালিককে ফিরিয়ে দিতে চান জমিটা। কিন্তু জমির মালিক ফেরৎ নিবেন না। চার লাখ টাকা দিয়ে দুঃখ আর হতাশা কিনে নিয়েছেন। রাগে ক্ষোভে এ কথা বলেন পলাশ। পলাশ আর ধান আবাদ করতে চান না।

**কেস স্টাডি- ২ঃ বর্গাচুক্তিতে বোরো ধান আবাদ করে ক্ষতিগ্রস্ত অতুল চন্দ্র**

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার শিংপাড়া গ্রামের অতুল চন্দ্র রায় জানালেন, গত ২ বছর ধরে তিনি চুক্তিতে ২ বিঘা জমি বোরো মৌসুমে আবাদ করেন। প্রতি বিঘা ৪৫০০ টাকা চুক্তিতে। এবার বোরো ধান আবাদ করে তিনি চুক্তির পুঁজি হারিয়ে ফেলেছেন। ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। আর চুক্তির জমিতে প্রতি বিঘায় তার ক্ষতি ৬৭৫০ টাকা। চোখে সরষের ফুল দেখছেন অতুল।

**কেস স্টাডি- ৩ঃ নিজ জমিতে বোরো আবাদে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক**

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার রানীভবানীপুর গ্রামের কৃষক খেজমত আলী (বয়স ৭০ বছর)। নিজের ৮০ শতক জমিতে এবার বোরো ধান আবাদ করেন। ধান বিক্রি করে প্রতি বিঘায় লোকসান ২০০০ টাকা। প্রতিমণ ধান বিক্রি করেন ৩০০-৩৫০ টাকা। ধান আবাদ ছেড়ে দিতে চান খেজমত আলী। কিন্তু জমিতে অন্য কি আবাদ করবেন তা ঠিক করতে পারেন না। ধান আবাদ করলেই লোকসান! হতাশার তিমিরে নিমজ্জিত এই কৃষক।

## ৫.০ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

ধান আবাদে উৎপাদন খরচ দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে বোরো ধান আবাদ করতে কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। নিজের জমিটা আছে কিন্তু আবাদের জন্য পুঁজির অভাব হয়। ছোট ও মাঝারি কৃষক সবাই ঋণের জালে বাঁধা। বড় কৃষকও সংকটে। ব্যাংক ঋণ পাওয়া সোনার হরিণ। যদিও সরকার কৃষকের জন্য ব্যাংক ঋণের কথা বলছে অহরহ। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকেই চড়া সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে ধান আবাদ করার জন্য। বেসরকারী সাহায্য সংস্থা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে যেসব প্রতিষ্ঠান সেখান থেকেও কৃষক চড়া সুদে ঋণ সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে। চড়া সুদে ঋণ নেয়া কৃষকের সংখ্যাটা বিশাল। মাঠ পর্যায়ে আলাপ করে জানা যায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া সহজ নয়। জটিল প্রক্রিয়া।

কৃষি ঋণের চিন্তা ক্ষুদ, মাঝারি ও বড় কৃষক করে না। ধান আবাদ করতে পুঁজির সংস্থান কিভাবে সহজ করা যায় তা ভাবতে হবে। কৃষক জমি বন্ধক দিচ্ছে পুঁজির জন্য। চড়া সুদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য জমিও বিক্রি করছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শতাধিক কৃষকের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, বোরো ধানের উৎপাদন খরচ দিন দিন বাড়ছেই। ধানের দাম নেই; তাই বছরের পর বছর কৃষক ধানের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। এক বিঘা(.৩৩ একর) জমিতে বোরো ধান আবাদ করতে খরচ প্রায় এগার হাজার পাঁচশত টাকা। বোরো ধান উৎপাদনের জন্য লাগে জমি। কৃষকের নিজের জমি হলে এক বিঘাতে উৎপাদন খরচ ১১,৫০০ টাকা। কিন্তু বর্গা চুক্তি নেয়া জমিতে যে কৃষক বোরো ধান আবাদ করে তার খরচটা আরো বেড়ে যায়। বোরো ধানের মৌসুমে চুক্তি নিলে জমির মালিককে দিতে হয় ৪৫০০-৫০০০ টাকা। চুক্তির ধরণের রকম-ফের আছে। এটা একটা বড় আলোচনা। মাঠ পর্যায়ের তথ্যে জানা যায়, কৃষি জমির প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ জমি চুক্তি-বর্গা আবাদ হচ্ছে। বোরো, আমন, আউশ যে কোন ধান আবাদেঃ উৎপাদন খরচ বাড়ছে দিন দিন। তবে বোরো ধান আবাদে খরচটা বেশি। ধানের বীজ, চাষ দেয়া, ধান লাগানো, সেচ, রাসায়নিক সার, জৈব সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ঔষধ, নিড়ানি খরচ, ধান কাটা খরচ, ধান মাড়াই খরচ ইত্যাদি বোরো ধান উৎপাদনে অপরিহার্য খরচ। প্রতি বিঘায় মোটা ধানের (হাইব্রিড, বিরি ২৮,২৯ ইত্যাদি) ফলন গড়ে ২৭ মণ। ধান কাটার পর বাজারে ধানের দাম না পেয়ে হতাশ কৃষক। এবার প্রতিমণ ধানের দাম ৩৫০-৪০০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে কৃষক। নিজের জমিতে প্রতিবিঘা ধান আবাদে ২০০০ টাকা লোকসান দিয়েছে। আর চুক্তি-বর্গাদার কৃষক প্রতিবিঘা ধান আবাদ করে প্রায় ৭০০০ টাকা লোকসান দিয়েছে। অবর্নণীয় ক্ষতির সম্মুখীন এবার কৃষক।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD) গত ১১ জুন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছেন কৃষকের বোরো ধান উৎপাদন করে ক্ষতির দিকটা। দেশে ১ কোটি ৮০ লাখ কৃষকের কৃষি কার্ড আছে। ব্যাংক হিসেব আছে। সিপিডি কৃষি কার্ডের বিপরীতে প্রত্যেক কৃষককে ৫০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পরামর্শ এবং সুপারিশ করেছে। ১ কোটি ৮০ লাখ কৃষি কার্ডের বিপরীতে ৫০০০ টাকা করে দিলে সরকারের ব্যয় হবে ৯ হাজার ১ শত কোটি টাকা (প্রথম আলো, ১২ জুন ২০১৯)। সিপিডি-র সুপারিশ সরকার বিবেচনায় নেয়নি। যদিও এ সুপারিশ বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা আছে। কৃষি কার্ড আছে শুধু মাত্র জমির মালিকের। চুক্তি বর্গা এবং লিজ নিয়ে যে কৃষক ধান আবাদ করছে তার কৃষি কার্ড নাই। অথচ চুক্তি বর্গাদার কৃষক প্রায় ৪০ ভাগ। চুক্তি বর্গা নিয়ে যারা ধান আবাদ করেন তাদের কৃষি কার্ড দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা জরুরি।

সরকার ২৬ টাকা কেজি দরে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। সরাসরি কৃষক থেকে ধান ক্রয় এর জন্য সরকারী সদিচ্ছার অভাব নেই হয়তো। কিন্তু কৃষক সরাসরি খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছে না– এটাই বাস্তবতা। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিস্কার হবে। ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম লেহেম্বা। ঐ ইউনিয়নে ৪৭ জন কৃষক (কৃষি কার্ডধারী কৃষক) খাদ্য গুদামে ধান বিক্রির স্লিপ পায়। প্রত্যেক কৃষক ৬০০ কেজি করে ধান বিক্রি করতে পারবেন ২৬ টাকা কেজি দরে (১০৪০ টাকা মন)। ঐ ৪৭ জন কৃষককে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত পাঁচজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা তাদের কার্ডগুলি বিক্রি করে দিয়েছেন। প্রতিটি কার্ড ২৫০০ টাকা করে কিনেছেন একজন ফরিয়া। ঐ ফরিয়া উপজেলা পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে কার্ডগুলো কিছু লাভে বিক্রি করবেন। জানা যায় ফরিয়ারা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন

গ্রামে। ক্ষমতা বলয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত মধ্যস্বত্বভোগীরা ধান দেন খাদ্য গুদামে। ফরিয়ারা তাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। মধ্যস্বত্বভোগী যারা ক্ষমতা বলয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তারাই কেবলমাত্র খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহ করেন। কৃষকের সঙ্গে এবং একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ করে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়। কৃষক সরাসরি কোন দিন ধান বিক্রি করতে পারেনি ধাদ্য গুদামে। ধান ঠিকমতো শুকানো হয়নি, ধানে ধুলাবালি আছে- এমন অজুহাত দেখিয়ে খাদ্য গুদাম কর্তৃপক্ষ কৃষকের ধান ক্রয় করে না। কৃষক এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে চায়ও না। কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে খাদ্যগুদাম বহু বছর ধরে।

চাল ঘাটতির অজুহাতে লাগামহীন চাল আমদানি কৃষকের বড় ক্ষতির জন্য দায়ী। আমদানি শুল্ক ছাড়া বা স্বল্প শুল্কে চাল আমদানি কৃষককে সর্বশান্ত করেছে। ২০১৭ সালে ১০ লাখ টন চালের ঘাটতি পূরণের জন্য হয়তো চাল আমদানির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চাল আমদানির ক্ষেত্রে কোন মনিটরিং ছিল না সরকারের। তাই এক বছরের মধ্যে (২০১৮ -এর জুন) ৮২ লক্ষ টন চাল আমদানি করা হয় ভারত থেকে। চালকল মালিকরাও ভারতীয় চাল আমদানির কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হন। চালকল মালিকরা প্রধানত কৃষকের ধান ক্রয় করে। তারা ধান না কিনলে ধানের দাম পায় না কৃষক। এবার বোরো মৌসুমে চালকল মালিকরা ধান ক্রয়ে অনীহা দেখিয়েছেন। তিন-চারশত টাকা মণ দরে ধান কিনেছেন। কৃষক মহা সংকটে পড়েছে লাগামহীন চাল আমদানির কারণেই। চাল আমদানি বা রপ্তানি ক্ষেত্রে সু-চিন্তিত এবং সু-নির্দিষ্ট পলিসি থাকলে কৃষক বাঁচতে পারে। বঞ্চনার নিষ্পেষন থেকে বেরিয়ে কৃষিকে বাঁচাতে পারে । কৃষক না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না -এ কথা যেন ভুলে না যাই।